সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে

সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২ মার্চ, ২০১৬)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২২ মার্চ ২০১৬ থেকে ৪ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সারাদেশের ৪২৭৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দলীয় প্রতীকে (শুধুমাত্র চেয়ারম্যান পদে) অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাই দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে এই নির্বাচনকে ঘিরে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমরা সুজনের পক্ষ থেকে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রথম ধাপে ৭৫২টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ২২ মার্চ ২০১৬, দ্বিতীয় ধাপে ৭১০টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ৩১ মার্চ ২০১৬, তৃতীয় ধাপে ৭১১টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ২৩ এপ্রিল ২০১৬, চতুর্থ ধাপে ৭২৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ৭ মে ২০১৬, পঞ্চম ধাপে ৭১৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ২৮ মে ২০১৬ এবং ষষ্ঠ ধাপে ৬৬০টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ৪ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রথম ধাপের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল ও যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; তবে তা ৭৫২টির পরিবর্তে ৭৩৮টির ইউনিয়ন পরিষদের জন্য। দ্বিতীয় ধাপে ৭১০টি ইউনিয়নের নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে ৬৮৪টির; যার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আজ ২ মার্চ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী প্রথম ধাপের ৭৩৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মোট ৩৫৬৮ জন। এর মধ্যে ১৬টি রাজনৈতিক দলের ১৯০০ এবং স্বতন্ত্র ১৬৬৮ জন। ৭৩৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৭৪১ জন প্রার্থী। খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার যোগীপল, কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আমবাড়ীয়া এবং কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২জন করে চেয়ারম্যান প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি থেকে ৬৬৭টি, জাতীয় পার্টি থেকে ১৪৮টি, জাতীয় পার্টি-জেপি থেকে ২০টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে ২৪৫টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ থেকে ৩০টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে ২৪টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি থেকে ৪টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ থেকে ৫টি, বিএনএফ থেকে ৭টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থেকে ২টি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ থেকে ২টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন, কল্যাণ পার্টি ও জাকের পার্টি থেকে ১টি করে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য চেয়ারম্যান প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারি,২০১৬)।

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠা শুরু হয়েছে। দৃশ্যমান হচ্ছে অনেক নেতিবাচক অনুষঙ্গ। তাই এই নির্বাচনের সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে শঙ্কা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিএনপি'র পক্ষ থেকে অনেক আগে থেকেই এমন শঙ্কা ও সন্দেহের কথা বলা হলেও সরকারের শরিক দলগুলো থেকেও এমন অভিযোগ উঠছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার জাতীয় সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু করার দাবি জানিয়ে বলেন, ' ইউপি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমার দলের লোকদেরও বাধা দেওয়া হয়েছে। এটা আমি জানি। এই নির্বাচন যদি যথাযথভাবে পরিচালিত না হয়, তাহলে মানুষ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়বে। নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী। কিন্তু তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারছে না। পৌরসভার ভোটেও আগের রাতে বাক্স ভরে রাখা, জাল ভোট প্রদান এবং কেন্দ্র দখলের অভিযোগ উঠেছিল। ইউপি নির্বাচনে এই অবস্থা হলে গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর মানুষ আস্থা হারাবে। তখন কোনো নির্বাচনই মানুষ আর বিশ্বাস করবে না।' (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারি,২০১৬)।

আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছিলাম যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন রাজনৈতিক দলভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। আমাদের বক্তব্য ছিল - রাজনৈতিক দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিরাজমান দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবকে গ্রামাঞ্চল তথা ঘরে ঘরে বিস্তৃত করবে। নির্বাচনের পূর্বেই রাজনৈতিক দলসমূহ নিজেদের মধ্যেই দলাদলিতে জড়িয়ে পড়বে। মনোনয়ন বাণিজ্যের বিস্তৃতি তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের পরিবর্তে অর্থ ও পেশিশক্তির অধিকারীরা অধিকহারে মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। দলগতভাবে জয়লাভের মরিয়া প্রচেষ্টায় নির্বাচনী সহিংসতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক যে কোনো মূল্যে জয়ের আকাঙ্ক্ষাও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। দলীয়করণের প্রভাবের কারণে দায়িত্ব পালনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা দেখা দেবে। কর্তব্য পালনে সাহসের অভাব ও নির্বাচনী অনিয়ম কঠোরভাবে দমন করতে না পারার ব্যর্থতায় কমিশনের বিরুদ্ধে সক্ষমতা ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ, এমনকি নির্বাচনের

গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়াসহ ছোট ছোট রাজনৈতিক দলসমূহের উৎসাহের কমতির কারণে প্রার্থী সংখ্যা হ্রাস পাবে। দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের কারণে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসবে।

যে আশঙ্কাগুলো আমরা আগে থেকেই করে আসছিলাম, তার প্রায় সবগুলোই সত্যে পরিণত হয়েছে গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই সেসকল অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর মধ্যে মনোনয়ন বাণিজ্য; মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধাদান ও ছিনিয়ে নেওয়া; যাচাই-বাছাইয়ের সময় প্রভাবিত হয়ে বা অর্থের বিনিময়ে প্রার্থীতা বাতিল বা প্রার্থীতা বৈধকরণ; নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বা প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও মারধর করা, দৃশ্যমান অনিয়ম এমন কি অভিযোগ দায়েরের পরেও নির্বচন কমিশন কর্তৃক ব্যবস্থা না নেওয়া; এক ইউনিয়নে একটি রাজনৈতিক দল থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও নির্বাচনী আইন অনুযায়ী সবগুলো বাতিল না হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়াও নির্বাচনের তারিখ বেশ দূরে থাকলেও এখন থেকেই সংঘর্ষ শুরু হওয়া; ২৫টি ইউনিয়নে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের একককভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল; অনেক ইউনিয়নে বিএনপি থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রার্থী পাওয়া না যাওয়া; ১১৪টি ইউনিয়নে বিএনপি'র প্রার্থী না থাকা, অতীতের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা হ্রাস পাওয়া; দক্ষ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীর পরিবর্তে অনেক ইউনিয়নেই রাজনৈতিক দল থেকে অযোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদানের অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আমরা নেতিবাচক বলে মনে করছি। ৭৩৮ টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ১২ জন নারীর (৬ জন আওয়ামী লীগ ও ৬ জন বিএনপি থেকে) চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নকেও আমরা উদ্বেগের বিষয় বলে মনে করছি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ মার্চ ২০১৬) ইউপি নির্বাচনের চেয়ারম্যান পদে ব্যবসায়ী ও মামলা সংশ্লিষ্টদের প্রাধান্য লক্ষ্য করছি।

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্য একটি আলোচিত বিষয়। সারাদেশেই বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে মনোনয়ন বাণিজ্যের ঘটনা ঘটেছে। ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলার পাটকেলঘাটা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন শহিদুল ইসলাম হৃদয়। তাঁর অভিযোগ তৃণমূল আওয়ামী লীগ তাঁকে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দিতে সংগঠনটির জেলা পর্যায়ে সুপারিশ পাঠিয়েছিল। কিন্তু টাকার বিনিময়ে জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা শিশির দাসের নাম পাঠান কেন্দ্রে। পরে দল শিশির দাসকেই মনোনয়ন দেয়। ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার দেউলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী হিসেবে স্থানীয় আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক শাহজাদা তালুকদারের নাম ঠিক করে জেলায় পাঠানো হয়। জেলা থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় সদ্য আওয়ামী লীগে যোগদানকারী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান বাবুলকে। শাহজাদা তালুকদার অভিযোগ করেছেন অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান বাবুলকে টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে (তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ, ১ মার্চ, ২০১৬)। শুধুমাত্র আওয়ামী লীগেই নয় বিএপিতেও মনোনয়ন বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় তৃণমূলের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে সাবেক এমপি শাহ শহীদ সারোয়ারের বিরুদ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ এনে তৃণমূলের শতাধিক বিএনপি নেতা কর্মী আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলা রামভদ্রপুর ইউনিয়নে (তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ ফেব্রুয়ারি)। কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি'র সভাপতি সম্পাদকের বিরুদ্ধে ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জামায়াত কর্মী ও চিহ্নিত চোরাকারবারীর কাছে মনোনয়ন বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন জেলার সরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বদরুজ্জামান মোড়ল (২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। জানা গেছে যে, বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার একটি বড় কারণ মনোনয়ন বাণিজ্য ও তৃণমূলের মতামতকে উপেক্ষা করে মনোনয়ন প্রদান। অনেক স্থানে তৃণমূলের বর্তমান চেয়াম্যানকে ও জনপ্রিয় প্রার্থীদেরকেও মনোনয়ন দেওয়া হয়নি মনোনয়ন বানিজ্যের কারণে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি'র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন যে, 'হুমকি-ধামকি ও তুচ্ছ অজুহাতে স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তা বিএনপি প্রার্থীদের প্রার্থীতা বাতিল করেছেন। এতে প্রায় ১১৪ জনের মত বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা হারিয়েছেন।' (তথ্যসূত্র: মানবজমিন, ২৬ ফেব্রয়ারি, ২০১৬)। বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমাদানে সরকার দলীয় প্রার্থী সমর্থকদের বাধাদানে অভিযোগও রয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ' বিএনপি প্রার্থীরা অভিযোগ করেছেন প্রশাসনের সামনে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি ও সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার বেশ কয়েকটি ইউপিতে বিএনপি মনোনীত সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র ছিনতাই হয়ে গেছে।' (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। শুধুমাত্র ঝালকাঠি বা সাতক্ষীরা নয়, দেশের আরও অনেক অঞ্চলে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি – যারা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য ক্ষণ গুনছেন। এই ২৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ১৯টিই বাগেরহাট জেলার (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। এখনও কোনো কোনো ইউনিয়নের প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বাগেরহাট জেলার বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোহাম্মদ শামিম আহসানকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে তিনি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন। একই ধরনের অভিযোগ করেছেন বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার বাঁশতলী ইউনিয়নের বিএনপি দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী এসএম আব্দুল্লাহ্ আজমী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ফকির শাহাদাত

হোসেন। ফকির শাহাদাত হোসেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকির সাথে সাথে তাঁকে মারধরেরও অভিযোগ আনেন (তথ্যসূত্র: যুগান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি,২০১৬)। শুধুমাত্র দলের বিরুদ্ধে নয় নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। বাক্ষণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুরে প্রার্থীতা যাচাই-বাছায়ের সময় উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে মনোনয়নপত্র বাতিল ও ত্রুটিপূর্ণ মনোনয়নপত্র গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে (তথ্যসূত্র: যুগান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি,২০১৬)।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার যোগীপল, কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আমবাড়ীয়া এবং কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২জন করে চেয়ারম্যান প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। নিয়মানুযায়ী সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র হওয়ার কথা। কিন্তু কোনো আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে বলে আমরা শুনিনি।

আমরা মনে করি যে, যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই হঠাৎ করে দলভিত্তিক নির্বাচনের কারণেই আমাদেরকে বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করে ধীরে ধীরে দলভিত্তিক নির্বাচনে গেলে অনেকগুলো সমস্যা এড়ানো যেত। সুনিদিষ্ট মনোনয়ন পদ্ধতি ঠিক না করে দেওয়ায়, প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দল থেকে শুরু করে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার কার্যালয় পর্যন্ত জটিলতায় জড়িয়ে পড়ছে। এতে নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানটিও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। দলাদলি, প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, মারামারি যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে এই নির্বাচন সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টের একটি বড় কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। নিজ দলের মধ্যে দলাদলির ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনরাই অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা এবং আচরণবিধিসহ নির্বাচনী আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলা। একইসঙ্গে দলগুলোকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন দিতে হবে। নির্বাচনকে প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করে 'যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়া' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসতে হবে তাদের।

একটি নির্বাচনের সঙ্গে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকলেও নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের আইনী, নৈতিকতাপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সাহসী ভূমিকাই পারে কোনো নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচন কমিশন যদি যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতো, তবে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঠকানো সম্ভব হতো। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্লিপ্ততায় আমরা হতাশ। এমনিতেই আমাদের বর্তমান নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ রয়েছে। তদুপরি সরকার কর্তৃক কমিশনের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা কেড়ে নেয়াসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে জরিমানা করার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। এতে করে সমস্যা আরও বাড়বে।

নির্বাচন কমিশন আগে থেকেই বলে দিয়েছে যে, অভিযোগ না পেলে তারা কোনো অনিয়মের বিষয়কে আমলে নেবে না। কিন্তু অভিযোগ করলেও তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অন্যায়ের শস্তি না হলে অবধারিতভাবেই অন্যায় বৃদ্ধি পায়। পৌর নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন যদি অন্যায়কারীদের শাস্তির আওতায় আনতো, তবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অনিয়মের ঘটনা কম ঘটতো। এটা নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতার অভাব, না কী নিরপেক্ষতার অভাব? উল্লেখ্য যে, *নূর হোসেন বনাম নজরুল ইসলাম* মামলায় [৫ বিএলসি (এডি) ২০০০] আমাদের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, নির্বাচনের সময়ে কারচুপির খবর প্রকাশিত হলে কিংবা এব্যাপারে অভিযোগ করা হলে, তদন্তসাপেক্ষে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বাতিল করতে পারে। কোনো নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ উঠলে কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে জেল-জরিমানা করার ক্ষমতা। কিন্তু আমাদের স্বাধীন নির্বাচন কমিশন যেন ক্ষমতা প্রয়োগে অপারগ বা অনাগ্রহী। তাই আচরণবিধি লঙ্ঘন ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেই চলেছে। নির্বাচন কমিশনকে মনে রাখতে হবে যে, তাদের দায়িত্ব প্রতিকার নয়, প্রতিরোধ করা।

আমরা চাই, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যথাযথ ভূমিকা পালন করুক। এক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। পাশাপাশি সকল দল ও প্রার্থীর জন্য 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করতে হবে। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভোটদানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই রোধে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর একটি বিষয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, নির্বাচনে যারা প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় তাদের মনোনয়নপত্র জমাদানের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন কার্যালয়সহ অনেকগুলো স্থান

নির্ধারণের পাশাপাশি অন লাইনে জমাদানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে; যা সুজনের দীর্ঘদিনের দাবি। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, অন লাইনে দাখিলের বিধান না করে শুধুমাত্র একাধিক স্থানে মনোনয়নপত্র জমাদানের বিধান করলে, উদ্ভুত সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে।

একটি নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ করার ক্ষেত্রে সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু আমরা প্রায়শই সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নির্বাচনী নিয়ম-কানুন মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ্য করি। এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখেও আমরা কোনো কোনো এলাকায় সরকার কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে দেখছি – যা নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সরকারকে অবশ্যই নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হচ্ছে যথানিয়মে সক্ষমতার সাথে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। পাশাপাশি সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণসহ আচরণবিধিতে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ যাতে নির্বাচনী আচরণবিধির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত না করেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাতে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন সেজন্য তাদেরকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

আশির দশকের একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে এনে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে অব্যাহত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আমরা পুরোপুরি পরিশুদ্ধ করে ফেলেছিলাম, তা আবারও আমরা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি কী না, সাম্প্রতিক অতীতের কয়েকটি নির্বাচনের পর জনমনে এই অশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে সত্যি সত্যিই আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। ভেঙ্গে পড়বে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও – যা কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তার অন্যতম ছিল গণতন্ত্র। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রথম ধাপ। তাই সফলভাবে প্রথম ধাপ পেরিয়েই জাতিগতভাবে আমরা গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে চাই। নির্বাচনী ধাপটি আমরা তখনই সফলভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হবো, যখন নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবো। নিশ্চয় আমরা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসহ আগামী দিনে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ করতে সক্ষম হবো।